শতবর্ষে পূর্ববঙ্গ গীতিকা : একটি বিপ্রতীপ উপস্থাপন

STURJ, Vol. 1, Issue 2-, DoP: 06.08.2021

ড. নির্মল দাশ

সারসংক্ষেপ :

পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র সংকলন প্রকাশের শতবর্ষ আসন্ন। প্রথমে, সম্পাদনার (১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ) এই মহৎ কর্মটি সম্পন্ন করেছেন অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেন। পরবর্তী সময়ে একক ভাবে সংগ্রহ ও সম্পাদনা করেছেন ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক। গ্রাম্যকবিরা সমসাময়িক সত্য ঘটনাকে অবলম্বন করে পদ্যছন্দে এগুলো রচনা করেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে গীতিকাগুলোতে নারীদের কথাই বলেছেন পল্লীকবিরা। সেসব নারীরা প্রেমে আস্থা রাখেন, ভালোবাসার মানুষের জন্য নিজের জীবনকেও উৎসর্গ করতে দ্বিধান্বিত নয়। তারা ব্যতিক্রমী। এর জন্য তারা নানা প্রতিকূলতার মুখেও পড়েছে বার বার। সেসময়ে জনসমক্ষে গানে গানে এগুলো পরিবেশিত হয়েছে। এ-যাবৎ 'ময়নামনসিংহ-গীতিকা' তথা 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র যত আলোচনা- পর্যালোচনা হয়েছে, সেখানে এগুলোকে প্রেম-আখ্যানমূলক সঙ্গীত রূপেই চিহ্নিত করা হয়েছে। অথচ, এসবের যে ভিন্ন একটি দিকও থাকতে পারে, তা ভেবে দেখা হয়নি। আমাদের সুপ্রাচীন পিতামহরা একসময় গোষ্ঠীজীবনের অধিবাসী ছিল। শিকার করেই তারা জীবন নির্বাহ করেছে। সেদিন থেকেই মানুষ গান গেয়েছে এবং নৃত্য করেছে। ক্রমে মানুষ কৃষিজীবনে প্রবেশ করেছে। তখন মানুষের প্রকৃতি-নির্ভরতা বেড়ে গেছে অনেক গুণ বেশি। প্রকৃতি তুষ্ট না থাকলে অনাবৃষ্টি হবে, অথবা হবে অতিবৃষ্টি। যথাসময়ে উঠবে না সূর্য। তাছাড়া, নারীদের বিশেষ ক্ষমতার দিকটিও মানুষ দীর্ঘ পর্যবেক্ষণে আবিষ্কার করেছে। আর প্রকৃতিকে মানুষ আয়ত্বে আনার জন্য বিচিত্র ক্রিয়াকর্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। পূর্ববঙ্গ গীতিকা সেই সুদীর্ঘ কর্মপ্রক্রিয়ারই অঙ্গবিশেষ।

সূচক শব্দ : পূর্ববঙ্গ গীতিকা, দীনেশচন্দ্র সেন, ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক, আমাদের সুপ্রাচীন পিতামহরা, কৃষিজীবন,

নারীবন্দনা .

এক

পণ্ডিত দীনেশচন্দ্র সেন ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র একটি সংকলন সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। এরপর ক্রমান্বয়ে ১৯২৩, ১৯৩০, ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে পর পর এর আরো তিনটি খণ্ড প্রকাশিত হয়। অধ্যাপক সেন প্রথম খণ্ডটিকে 'ময়নামনসিংহ-গীতিকা' নামকরণ করলেও পরবর্তী খণ্ডগুলোকে বলেছেন 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'। পরবর্তীকালে, সবগুলো খণ্ডকেই তিনি বলেছেন 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'। তিনি আবার এগুলোর ইংরেজি অনুবাদ করে বৃহত্তর পাঠকমণ্ডলীর দরবারে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। তাঁর এই উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। আলোচক-সমালোচক-গবেষকেরা ব্যাপকভাবে আলোড়িত হয়েছেন। গীতিকাগুলো যে মধ্যযুগের সাহিত্য সম্পদ তা-ও এখন সর্বজনস্বীকৃত। পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি, ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক ব্যক্তিগতভাবে পুনরায় গীতিকাগুলোর পাঠ সংগ্রহের কাজে ব্রতী হয়েছেন। 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা' শিরোনামে সাত খণ্ডে এগুলো প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম খণ্ডটির প্রকাশকাল ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ। বর্তমান আলোচনায় গীতিকাগুলোকে 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'ই বলা হবে। সাধারণভাবে এগুলোকে 'পালাগান'ও বলা হয়।

অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় পড়ুয়াদের উপযোগী করে নির্বাচিত গীতিকার একটি সংকলন প্রকাশ করেছেন। 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' নামাঙ্কিত বইটির ভূমিকা লিখতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন—"এদের লোকসাহিত্য বলার কোনো কারণ নেই" (মুখোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায় , ২০১৯ , ভূমিকা)। সম্পাদিত গ্রন্থটির প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কিছু কথা মুদ্রিত রয়েছে। সেখানে 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'গুলোকে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করেই লোকসাহিত্যের মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন --

"ময়মনসিংহ থেকে যে সব গাথা সংগ্রহ করা হয়েছে তাতে সহজেই বেজে উঠেছে বিশ্বসাহিত্যের সুর। কোন শহুরে পাবলিকের ফরমাশের ছাঁচে ঢালা সাহিত্য তো সে নয় । মানুষের চিরকালের সুখদুঃখের প্রেরণায় লেখা সেই গাঁথা । যদি বা ভীড়ের মধ্যে গাওয়া হয়েও থাকে , তবুও এ ভীড় বিশেষ কালের ভীড় নয় । তাই, এ সাহিত্য সেই ফসলের মতো যা গ্রামের লোক আপন মাটির বাসনে ভোগ করে থাকে। তবুও তা বিশ্বেরেই ফসল –– ধানের মঞ্জরী।"

রবীন্দ্রনাথ আরো লিখেছেন --

" কাব্য পরিচয়ে যে বাউলের গানগুলি আছে সে আমার মাথায় কিংবা কলমে আসত না লোক ঠকাতে গেলে নিশ্চয় ধরা পড়তুম । ময়মনসিংহ গীতিকাও অনেকটা তাই। প্রচলিত লোকসাহিত্যের গ্রন্থসত্ত্ব থাকে না, মুখে মুখে তার ব্যাবহার চলে , নানা হাতের ছাপ পড়ে , তবু মোটের উপর তার ঐক্যধারা নষ্ট হয় না । ওর মধ্যে যে একটা আশ্চর্য কবিত্ব আছে ইতিপূর্বে তার এমন দুর্যোগ ঘটেনি যাতে একেবারে তার সুর কেটে যায় ,তাল কেটে যায় । ওর ভিতরকার জিনিসি রয়ে গেছে , সেটা নষ্ট করার সাধ্য কারো নেই----বাইরে দুটো-একটা জায়গায় একটু- আধটু চুনবালির পলস্তারা লাগালেও ইমারতটা বাতিল হয়ে যায় না । ময়মনসিংহ গীতিকার কালনির্ণয় চলে না ,জাত নির্ণয় চলে , ওটা আবহমান কালের , কেবল ওটা কলেজি কালের বাইরে । এই কাল ওতে রিফু করতে যায় যদি সেটা তখনি ধরা পড়ে এবং সেটাতে সবটার দাম নষ্ট হবে না ।" (তদেব , ভূমিকা)।

এককালে পূর্ববঙ্গ গীতিকাগুলো জনসমক্ষে পালার আকারে পরিবেশিত হয়েছে। বর্তমানকালে চিত্ত মনোরঞ্জনকারী অসংখ্য মাধ্যম রয়েছে । ফলে , সাম্প্রতিককালে অনায়াসেই এসব মাধ্যমের সাহায্যে আনন্দ গ্রহণের সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে মানুষ। কিন্তু বিজ্ঞানের যখন এমন অভূতপূর্ব উন্নতি হয়নি, তখন বিনোদনের উপকরণও খুব বেশি ছিল না। বঙ্গভূমিতে গীতিকার গায়কেরা এগুলো পরিবেশনের মধ্য দিয়ে আনন্দ দান করতেন। যারা এগুলো পরিবেশন করেন, তারা শিল্পী। এইসব গীতিকা পরিবেশন করে তাদের মধ্যে কেউ কেউ জীবিকা নির্বাহও করতেন । সেকালে ঘটে যাওয়া কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা , কোন রাজা-জমিদারের প্রণয়, লোভ, কামনা-বাসনা, প্রতিহিংসা অথবা তাদের উত্থান-পতনের মতো চিত্ত আলোড়নকারী ঘটনাকে অবলম্বন করে পালাকারেরা রচনা করতেন দীর্ঘ গান । তার সংগে কথাও যুক্ত থাকত কখনো কখনো । গায়ক তথা পরিবেশক নিশ্চয় পরিবেশন কালে আকর্ষণীয় পরিবেশ তৈরি করতে পারতেন । এসবের চৌম্বকীয় ক্ষমতায় শ্রোতা-দর্শকেরা আবিষ্ট হয়ে থাকত। তাদের চিত্ত-বিনোদন ঘটত । পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ–এর আলোচনা থেকে কয়েকটি পংক্তির উল্লেখ করেছেন অধ্যাপক সুকুমার সেন । 'বাদ্যানীর পালা' অর্থা□ 'মহুয়া'র আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ কথাগুলো লিখেছেন । এহল পালা উপস্থাপনের প্রক্রিয়া।

"একটা ধনু, লাঠি, বর্শা হাতিয়ার। মাথায় রঙ্গীন ছোট পাগড়ী । পড়নে মালকোঁচা মারা ধূতি। আলো-মশাল । বাদ্য—ঢোল বা ঢোলক, মন্দিরা , বাঁশের বাঁশী, বেহালা, মেয়েদের লম্বা চুল । মটা কাপড়বা বেঁটে শাড়ী । কাঁসা ও পিতলের গহনা । বাঁশ ও দড়ি ইত্যাদি। গানের সঙ্গে সংলাপও থাকত প্রচুর" (সেন , ২০১৪ ,৫০৫)।

রোমান্টিকতায় মোড়া অপূর্ব প্রেম-আখ্যানমূলক গীতিকাগুলোতে কেবল নরনারীর কথাই প্রাধান্য পেয়েছে । অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ববঙ্গ গীতিকার পালাগুলোকে বিষয়বস্তুগত দিক থেকে তিনভাগে ভাগ করেছেন । যথা --

ক] লৌকিক প্রণয়গাথা ,

খ] ঐতিহাসিক–রোম্যান্টিক আখ্যান
গ] বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক আখ্যান

তিনি বলেছেন--

" এই পালাগুলিতে বিষয়বস্তুগত তিনটি ধারার পরিচয় পাওয়া যায় -- লৌকিক প্রণয়গাথা , ঐতিহাসিক –রোম্যান্টিক আখ্যান , বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক আখ্যান । .... লৌকিক প্রেম এবং তাহার বাধাবিপত্তি ও পরিণাম লইয়াই অধিকাংশ পালা রচিত হইয়াছে এবং শ্রেষ্ঠ পালাগুলি এই শ্রেণির অন্তর্গত " ।। (বন্দ্যোপাধ্যায় , ২০০৯-১০ , ৪৩৯) ।

পালাগুলোর বিষয়বস্তুতে ধর্ম কোন বাধার প্রাচীর তৈরি করেনি। হিন্দু জমিদার বা মুসলমান কাজি কর্তৃক হিন্দু কন্যা অপহরণের কাহিনি বর্ণনা করেছেন পল্লিকবি। কবি এ ক্ষেত্রে কুণ্ঠাহীন , আবার পালাগান হয়তো পরিবেশিত হচ্ছে কোন মুসলমান গৃহস্থের বাড়িতে। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে লোকবৃত্তের সাধারণ মানুষ গীতিকা পালাগুলোর শ্রোতা তথা উপভোক্তা। অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন --

" মধ্যযুগের শেষ ভাগে দেবদেবীর কথা বাদ দিয়া পাঁচালী ছড়া-গাথাকারেরা ... নরনারীর বিরহ মিলনের কথাকে একটা সহানুভূতির রসে আর্দ্র করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন , তাহার জন্য ধন্যবাদার্হ" (তদেব , ৪৪০) ।

পণ্ডিত-আলোচকেরা এসব গীতিকার অন্তর্গত মানব-মানবীর প্রেম ও ধর্ম নিরপেক্ষ স্বরূপকেই বিশেষভাবে আলোকে আনতে চেয়েছেন। নন্দদুলাল সেনগুপ্ত অবশ্য এ সম্পর্কে ভিন্ন কথাই বলেছেন। তাঁর অভিমত হল --

" এদেশের পারিবারিক স্বাধীন পরিবেশে স্বাধীন ভালোবাসা কোনোদিন প্রশ্রয় পায়নি, তাই পরকীয়াবাদকে এদেশে ধর্ম বলে চালাতে হয়েছে । তাই বিদ্যাসুন্দরকেও শেষে পর্যন্ত কালীমাহাত্ম্য দিয়ে বাঁচাতে হয়েছে। এই দেশে বর্ণাশ্রমবিরুদ্ধ প্রেম এবং তার জন্য সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ … এ সত্যই অদ্ভুত। …" (তদেব , ৪৪০-৪১) ।

নন্দদুলাল সেনগুপ্ত এখানে গতানুগতিক ছক থেকে বেরিয়ে এসেছেন।

পণ্ডিতদের কেউ কেউ গীতিকার জন্মস্থান হিসেবে খুব নির্দিষ্ট করে বলেন যে , ময়মনসিংহ জেলার পূর্বভাগে গীতিকাগুলোর জন্ম হয়েছে। ময়মনসিংহের মাটি যে সাহিত্যসৃষ্টির পক্ষে অনুকূল , এমন অভিমতও জানিয়েছেন কেউ কেউ। যুক্তি হিসেবে দেখানো হয় যে , ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতি সুদীর্ঘকাল সেখানে প্রবেশ করতে পারেনি । তাছাড়া সেখানে , "নানাবিধ আদিবাসী পাহাড়ী জাতির নিত্য আনাগোনা চলিত, মুসলমান ধর্মান্তরীকরণ সেখানে পুরাদমে চলিয়াছিল" (তদেব, ৪৪০-৪১), তাই গীতিকা রচিত হবার অনুকূল পরিবেশ সেখানে গড়ে উঠেছিল। অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আরো বলেছেন --

"সুতরাং স্থানীয় হিন্দুদের মধ্যে রক্ষণশীল মনোভাব ততটা ছিল না , থাকিলে ব্যর্থ প্রেমে হিন্দু-রমণীর আজীবন কুমারী থাকিবার কাহিনী এবং অসবর্ণ বিবাহের গল্প শ্রোতৃ সমাজে জনপ্রিয় হইতে পারিত না"(তদেব , ৪৪১) ।

এসব কথাগুলো গুরুত্ব সহকারে ভেবে দেখা এবং পর্যালোচনার আবশ্যকতা রয়েছে।

।। দুই।।'

পূর্ববঙ্গ গীতিকা' যে লোকসংস্কৃতির উপাদান সে বিষয়ে পণ্ডিতজনেরা একমত হয়েছেন। তবে , এগুলো যে মৈমনসিংহেরই লোকজ সম্পদ , আশ্চর্যজনকভাবে একথাটাই বার বার উচ্চারিত হয়েছে। অথচ , ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক যখন গীতিকাগুলোর সংগ্রহের কাজে নতুন করে ব্রতী হয়েছেন, তখন মৈমনসিংহ অঞ্চল ছাড়াও আরও কিছু কিছু স্থানে সেসবের সন্ধান পেয়েছেন। মৌলিক মহাশয় বলেছেন --

" ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ হইতে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আমি মৈমনসিংহ, ঢাকা ,ফরিদপুর, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা – এই ছয়টি জিলা হইতে প্রাচীন পালাগান সংগ্রহ করি। সেনে

মহাশয়ের [দীনেশ চন্দ্র সেন-এর] সংগ্রাহকগণের অনুসন্ধানও ঐ ছয়টি জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল” (মৌলিক-১ , ১৯৭৫ , ভূমিকা) ।

স্পষ্টতই, শুধুমাত্র মৈমেনসিংহ নয়, বঙ্গভূমির অন্যান্য অঞ্চলেও যে গীতিকাগুলির জন্ম হয়েছিল , তা মেনে নেওয়া যেতে পারে । একটি যায়গায় গীতিকার জন্ম হলে তা অন্যত্রও ছড়িয়ে পড়ে । একারণেই হয়তো দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর গীতিকা সংগ্রহের প্রথম খণ্ডটিকে মৈমেনসিংহ গীতিকা নামকরণ করলেও পরবর্তী খণ্ডগুলোকে বলছেন “পূর্ববঙ্গ গীতিকা”। ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক তাঁর সম্পাদিত “প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা” সপ্তম খণ্ডের ভূমিকায় লিখেছেন :

“সাধারণতঃ যে অঞ্চলের ঘটনা অবলম্বনে গাথাটি রচিত হইয়াছে সেই অঞ্চলের অধিবাসী গায়েনের খাতা দৃষ্টে আমি গাথা সংগ্রহ করিয়াছি।” (মৌলিক , ১৯৭৫ , ভূমিকা) ।

এটাই সত্য যে , কোন অঞ্চলে মনে থাকার মত বা উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা সংঘটিত হলে , প্রথমে তা সেই অঞ্চলটিকেই আলোড়িত করবে । সেই অঞ্চলে বসবাসকারী বা অন্য কোন অঞ্চলের কবি এটিকে পালার আকারে রূপদান করবেন । ফলে সব গীতিকাই ময়মনসিংহ অঞ্চলের লোককবির সৃষ্টি , এমন কোনো তত্ত্ব মেনে নিতে কষ্ট হয়।

উদাহরণস্বরূপ ,’আয়না বিবি’ পালাটি রয়েছে ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত ‘প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা’র প্রথম খণ্ডে । আবার তা রয়েছে দীনেশচন্দ্র সেনের ‘পূর্ববঙ্গ গীতিকা’র প্রথম খণ্ডে । পালাটির ভূমিকায় পালার কয়েকটি পংক্তির উল্লেখ সহ ক্ষিতীশচন্দ্রের অভিমত নিম্নরূপ --

“ চান্দের ভিটা☐ মামুদ উজ্জ্যাল সদাগর
আরে ভালা, তার কথা শুন দিয়া মন রে।

নারাইল খলার কানছা বাইয়া চলে ভেরোমন উজাইয়া
আরে ভালা ,পাড়ে বাড়ি দেখিতে সুন্দর রে।”

“ইহাতে বোঝা যায়, নারায়ণখলা গ্রামের পার্শ্ববর্তী ভেরোমন নদীর উজানে চান্দের ভিটা গ্রাম বর্তমান ত্রিপুরা জেলার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ছিল । এই অনুমান যদি সত্য হয়, তবে এই পালার ভাষায় পরবর্তীকালে বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষার অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে। ... ...” (মৌলিক-১ , ১৯৭০ , ২৮৬)।

ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিকের সংকলনের দ্বিতীয় খণ্ডে রয়েছে ‘মনির ওঝা – মাঞ্জুর মাও’ (মৌলিক-২, ১৯৭০, ৩৮১) পালাটি। সেখানে কবির জন্মস্থান-পরিচিতি দেওয়া নেই । তিনি লিখেছেন --

“এই পালাটি ‘ভাওয়াইয়া’ ছন্দে ‘সাগরী ঝাঁপ’ লহরে রচিত; সেজন্য মনে হয় কবির জন্মস্থান নোয়াখালি, ত্রিপুরা অথবা চট্টগ্রামে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে ছিল । এই সঙ্গে ইহাও লক্ষ্য করিয়াছি, ঐসব অঞ্চলেই ‘মাঞ্জুর মাও’ পালা গায়কেরা গাহিয়া থাকেন, অন্যত্র এ পালা গানের প্রচলন নাই” (তদেব , ৩৮১-৮২) ।

এখানে সম্পাদকের বক্তব্য তুলে ধরার অর্থ হল, বিষয়টির স্পষ্টতা দেওয়া । “পূর্ববঙ্গ গীতিকা”র রচয়িতারা এবং পালা গায়কেরা ছড়িয়ে ছিলেন সমগ্র বঙ্গদেশে জুড়ে। অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাতেও এর সমর্থন মেলে। তিনি লিখেছেন --

“ময়মনসিংহ এবং পূর্ববঙ্গের নানা স্থান হইতে (ত্রিপুরা–নোয়াখালি-চট্টগ্রাম) যে পালাগুলি আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হইয়াছে , অনাধুনিক বাংলা সাহিত্যে তাহা এক অভিনব ব্যাপার তাহাতে সন্দেহ নাই” (বন্দ্যোপাধ্যায় , ২০০৯-১০ , ৪২১) ।

বাঙলা সাহিত্যের মধ্যযুগে বাঙালি কবিরা দেবদেবীর ব্যাপক স্তুতি করেছেন, দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। আবার এই মাটিতেই বাঙালি কবিরা রচনা করেছেন ধর্মনিরপেক্ষ গীতিকা সাহিত্য । গীতিকা রচিত হবার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে পণ্ডিতেরা বলেন যে , সুবৃহৎ ময়মনসিংহের মত অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতি প্রবেশ করার সুযোগ লাভ করেনি। ফলে, তা ময়মনসিংহ বা বঙ্গের যে কোন স্থানেই হোক, একদিকে যখন রচিত হচ্ছে মঙ্গলকাব্য তখন সমান্তরালভাবে রচিত হয়ে চলেছে এসব গীতিকাগুলোও । গীতিকা যখন ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্য তখন মঙ্গলকাব্যগুলি দেবীমাহাত্ম্য প্রচারের দায়িত্ব নির্বাহ করছে । এখানে এসে সাহিত্যের দুটি ধারা আমাদের বিস্মিত করে । সুতরাং ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির প্রভাব–সংক্রান্ত তত্ত্বটিকে নিতান্ত গুরুত্বহীন বলে মনে হয়। বরং বিষয়টিকে ভিন্ন একটি দৃষ্টিকোণ থেকে ভেবে দেখা যেতে পারে।

এমনটাই হতে পারে যে, আকস্মিক ভাবে মাটি ভেদ করে গীতিকার জন্ম হয়নি। আপাতভাবে ,পণ্ডিতেরা গীতিকার জন্ম হওয়ার সময়কালকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তারও অনেক আগেই গীতিকার জন্ম হয়েছিল । এমন একটি সম্ভাবনার কথা আমরা ভাবতে পারি। বরং ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতি যত প্রভাব বিস্তার করেছে, বাঙালি জাতি নিজস্ব সংস্কৃতি-প্রবাহ থেকে ক্রমশ দূরে সরে এসেছে । ব্রাহ্মণ্য-সংস্কার বাঙালির সাংস্কৃতিক প্রবাহের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ালে, নতুন করে গীতিকার জন্ম নেবার গতি রুদ্ধ হয়েছে । ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতিতে নারীরা ব্রাত্য । তারপরও ময়মনসিংহ অঞ্চলে সেগুলোর অস্তিত্ব টিকে ছিল। কিন্তু হিন্দুরা এসব থেকে দূরে সরে এলেও মুসলমান সমাজের কবিরা গীতিকা'র চর্চা থেকে দূরে সরে আসেনি। তাঁদের জন্য অনুরূপ কোন গুরুতর ধর্মীয় তথা সামাজিক প্রতিবন্ধকতা সেসময় ছিল না ।

পণ্ডিতেরা বলেন, ময়মনসিংহ জেলায় "আদিবাসী ও পাহাড়ী জাতির নিত্য আনাগোনা চলিত," (বন্দ্যোপাধ্যায় , ২০০৯-১০ , ৪২১) এরই প্রভাব পড়েছে বাঙালি নর-নারীর মুক্ত জীবনে । পণ্ডিতেরা এমনভাবে বিষয়টি আমাদের বুঝিয়েছেন যে, আমরা তা নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছি । কিন্তু আদিবাসী জীবন ও সংস্কৃতির দিকে নজর ফেরালে ভিন্ন এক চিত্র আমদের সামনে হাজির হয়। আদিবাসীরা এখনও নিজেদের রক্ষণশীলতার প্রতি আস্থাবান । পাহাড়ের ঢালে তারা জুম চাষাবাদ করে। বন থেকে ফল-মুল এবং মাটির নীচ থেকে আলু সংগ্রহ করে। যৌথ চাষাবাদ প্রণালীর মাধ্যমে জুম-কর্ম সম্পাদিত হয়। এভাবেই বেঁচে থাকার উপযোগী করে নিজস্ব একটা অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া গড়ে তুলেছে তারা , তাহল বিনিময় প্রথা। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল , একেকটি টোটেমীয় গোষ্ঠীর মানুষ নিজেদের টোটেমে–অন্তর্গত রীতিপদ্ধতি–সংস্কারে গভীর আস্থা রাখে এবং মান্যতা দেয় । নারী-পুরুষের মেলামেশা , নারীদের স্বাধীন জীবনাচরণ যে ভাবেই হোক না কেন , সেটিও টোটেমীয় প্রথা পদ্ধতিকে মান্যতা দিয়েই । তারা নিজেদের বৃত্তের বাইরে অন্যদের সংগে মেলামেশার ক্ষেত্রেও সংযমী এবং রক্ষণশীল মনোভাবই পোষণ করে ।

আদিবাসীদের যখন এমনই সামাজিক অবস্থান , তখন পার্বত্য অঞ্চল ছেড়ে সমতল ভূমিতে বাঙালিদের সংগে মেলামেশার যে খুব বেশি সুযোগ নেই , তা বলার অপেক্ষা রাখে না । বৃহৎ ভাষা ও সংস্কৃতির আগ্রাসী চরিত্রের কথা আমরা জেনেছি । কিন্তু ছোট বাচকগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতির দ্বারা বড়ো সংস্কৃতির প্রভাবিত হওয়ার তত্ত্বটি অবাক হওয়ার মতো একটি বিষয় । ছোট বাচকগোষ্ঠীর সংস্কৃতির যৎসামান্য প্রভাব যে বড়ো সংস্কৃতিতে পড়ে না , এমন নয়। তবে সেই প্রভাবের গভীরতা কতখানি তা জেনে নেবার জন্য কোন ভাষাতাত্ত্বিকের প্রয়োজন পড়ে না। সে প্রভাব এমন গভীরও হতে পারে না , যেখানে একটি বৃহৎ জাতিগোষ্ঠীর নারী সমাজের চারিত্রিক কাঠামোতে এমনতরো একটি রদবদল ঘটে যেতে পারে। সুতরাং পণ্ডিতদের এধরনের একটি বহুল প্রচলিত সিদ্ধান্তকে বাতিল করে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাহলে কেন , বাঙালির সাহিত্য প্রবাহে এমন ব্যতিক্রমী ধারার জন্ম হল—তা ভেবে দেখার প্রয়োজন রয়েছে।

।। তিন ।।

সংস্কৃতি'র যে প্রবাহ , তা ছন্দহীন নয়। তার ধাবমানতায় যদি পাহাড়-প্রমাণ কোন বাধা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে বাঁক-পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে ওঠে। কিন্তু, এই যে পরিবর্তন ঘটে গেলে, সেসবের কারণসমূহ কোন না কোনভাবে তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে। সংস্কৃতির অগ্রসরমানতায় এই বিপর্যয়টুকুও অস্বাভাবিক নয়। পূর্ববঙ্গ গীতিকাগুলো যে কোন কার্যকারণ সম্পর্ক ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছে , তা নয়। গীতিকাগুলোর সঙ্গে মানুষের যে সম্পর্ক রচিত হয়েছিল , একালেও ছোট করে তাকে দেখার সুযোগ নেই। চাষাভুষো মানুষদের হৃদয়ের সম্পদ হল এই গীতিকাগুলো। শুধুমাত্র আনন্দ প্রাপ্তি নয় বরং গীতিকা পরিবেশনের সূত্র ধরে মানুষের আশা-আকাঙ্খার যেমন প্রকাশ ঘটে , তেমনি প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির বিষয়ও এখানে যুক্ত হয়ে যায়। গীতিকাগুলো ঐতিহ্যবাহী হয়েই আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে । এসবের আদিরূপের শরীরে সময়ের নানা প্রলেপ যেমন পড়েছে , তেমনি হারিয়ে গেছে নানা প্রাচীন উপকরণও । এর নেপথ্যে নানা সামাজিক আন্দোলন, অস্থিরতার ইতিহাস রয়েছে। ইউরোপের এ-জাতীয় ব্যালাড সম্পর্কে অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্যের লেখা থেকে একটি অভিমত এরূপ --

> " তাঁহারা [কোনো কোনো সমালোচক] এই উক্তি স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা মনে করেন , গীতিকা মধ্যযুগের সাহিত্যের অঙ্গ নহে ; ইহা স্বতন্ত্র ও স্বাধীন , লোকসাহিত্যের এক স্বতন্ত্র ধারা অনুসরণ করিয়া ইহাদের উদ্ভব হইয়াছে " (ভট্টাচার্য , ২০০৪ , ৩৩৮) ।

বাঙলা গীতিকাও যে স্বতন্ত্র ধারার সাহিত্য এবং আদিতে গীতিকা যে ভিন্ন তা□পর্য বহন করছে , তার ইঙ্গিত মেলে অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্যের লেখা থেকে (তদেব , ৩৩৮)। তিনি লিখিছেন--

> "গীতিকার উদ্ভব যে সময়েই হউক না কেন, ইহার সম্বন্ধে একটি কথা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন যে, ইহার মধ্যে কেবল মাত্র সমসাময়িক ভাব ও বস্তুরই যে সাক্ষা□কার লাভ করা যায় তাহাই নহে, 'but also the fossil remains of the lore of the folk reaching back to remoter antiquity.' এই সকল প্রস্তরীভূত আদিম উপকরণ সমূহের মৌলিক তা□পর্য লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ইহার ভিতর হইতে জাতীয় ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ এখনও সংগৃহীত হইতে পারে" (তদেব , ৩৩৮)।

অধ্যাপক ভট্টাচার্য গীতিকা সম্পর্কে কিছু সূত্র মাত্র উল্লেখে করছেন এখানে। ঠিক এই ভাবনাটিকে তিনি আর বেশিদূর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যান নি।

ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক যখন গীতিকা সংগ্রহের কাজ করছেন তখন তিনি গীতিকা পরিবেশনের নেপথ্যে যে বিশেষ উদ্দেশ্যও রয়েছে , তা লক্ষ্য করছেন । তিনি প্রথম খণ্ডে যা বলছেন, তার কয়েকটি পংক্তির উল্লেখে এখানে করছি।

> "পূর্ববঙ্গে বিবাহাদি উ□সব উপলক্ষে গায়েন ডাকিয়া পালাগান দেওয়া হয়। ইহাতে গায়েনদের বেশ ভালো প্রাপ্তি হইয়া থাকে। পূর্ববঙ্গে মৈমনসিংহ, ঢাকা, নোয়াখালি ও ফরিদপুর জেলার হিন্দু-মুসলমান কৃষকদের মধ্যে একটা সুদৃঢ় বিশ্বাস আছে, দেশে অনাবৃষ্টি দেখা দিলে ভালো গায়েন পালাগান গাহিয়া বৃষ্টি নামাইতে পারেন।" (মৌলিক-১ , ১৯৭০ , ভূমিকা)।

এর জন্য সাধারণত করুণ রসাত্মক পালাকে নির্বাচন করা হয়। গায়েনেরা একটানা গান করেন। প্রয়োজনবোধে সে গান কয়েকেরাত্রিও চলতে পারে। একটি ধুয়া বা ধ্রুবপদের উল্লেখে তিনি করছেন। গায়েনেরা একটি বিশেষ ধুয়া বা 'পাছ দোহার' গাইতে থাকেন --

> " ও কানা মঘোরে একবার ফিইর্যা চাও,
> এক মুইট ধানের ভাত খাই।।"

বৃষ্টিকে আবাহন করছেন পল্লী গায়েন অত্যন্ত বিনীত বাক্যে। অর্থা□, শুধুমাত্র আনন্দ গ্রহণ নয়, বরং গীতিকা পরিবেশিত হলে বৃষ্টি হবে, আর এর ফলে জমি শস্যশ্যামলা হয়ে উঠবে, এমন বিশ্বাস পোষণ করত সে

সময়রে মানুষ। অর্থা□ গৃহস্থরে বাড়তি যখন গীতকিা পরবিশেনরে আয়োজন হয় ,তখন নপেথ্যে থাকে কোনো স□ উদ্দশ্যে । তার ব্যক্তগিত নয় বরং তার নপেথ্যে থাকে সমষ্টরি মঙ্গল কামনা । ফলে, এসবকে কনে উদ্দশ্যে নরিপক্ষে বলা হবে – এমন একটি প্রশ্ন উত্থাপতি হওয়াই উচতি। মন্তব্যটরি সপক্ষে একটি উদাহরণ গ্রহণরে প্রয়োজন রয়ছে। ক্ষতিীশচন্দ্র মৌলকি কর্তৃক সংগৃহীত "কমলা কন্যার পালা" গীতকিাটি থকেে কছিু পংক্তি এখানে তুলে ধরা গলে।

"গায়নেরে বন্দনা --

ও কানা মঘোরে ,তুই না আমার ভাই।
এক ফোঁটা পানি দে সাইলরে ভাত খাই ।।
সাইলরে ভাত খাইতে খাইতে মুখে হইল রুচি।
মা লক্ষ্মীর নয়িরে রাইখ্যো ধান এক খুচি।।
আসন পাতয়িা তাতে দিও পদ্মরে আশি।
এইখানে গাইবাম আমি কমলার বারমাসী।।
এই গান গাইতে লাগে পাঁচ কড়া কড়ি।
এই গান গাইবাম আমি ভাগ্যমানরে বাড়ী।।
ভাগ্যমানরে বাড়ী না রে আছে দালান মঠ।
আসন পাতয়িা সামনে দেও রে জলরে ঘটা।।
দশে নাই রে বষ্টিি পানি ক্ষতেরে মাটি ফাটা।
পতিলা ঘট ভইরা দলিে লাগব মঘেরে ঘটা।।
ঘটরে উপরে আমি শাড়ি একখান পাই ।
দওেয়ার মঘে দয়া কইরব আর ভাবনা নাই।।"

(মৌলকি , ১৯৭১ , ১৭৩)

জমতিে শ্রমদান করা--- ফসল ফলানোর অন্যতম প্রধান শর্ত । কন্তিু তারই সমান্তরালে মানুষকে এর জন্য অলৌককি শক্তরি দ্বারস্থও হতে হয়। তাই 'এক ফোঁটা পানরি জন্য' মঘে-দবেতার কাছে মানুষরে আকুতরি প্রকাশই এখানে লক্ষ্য করি আমরা। পালাটরি বন্দনা অংশরে আরও পংক্তরি উল্লখে এখানে করা যতেে পার।ে

"স্বর্গতেে বন্দনা করি গো দবে ইন্দ্ররাজে।
যানার আদশেে সব মঘেগণ সাজে।।
পত্থিমিরি উপরে যত সাধুগুরুজন ।
মুসলমানরে পীর আর হঁদুর দবেতাগণ।।
সর্ব দবেগণে আমি করয়িা মন্নিতি।
বষ্টিি লামাইয়া দশেে দূর কর এই দুগগতি ।।
তারপরে বন্দনা গো করি গুরু ওস্তাদরে চরণ ।
যানার করিপায় মানুষ পায় বদি্যা জ্ঞান ।।
দবেরে আসরে আমি আইজ গাইবাম গান ।
মন্নিতি করয়িা বলি গানরে রাখবিা সম্মান।।
দ্বজি ঈশান রচলি এই না কমলার বারমাসী।
যে গান শুনয়িা কান্দে আসমানে মঘে আসি।।
সভাজনরে চরণে আমার কোটি নমস্কার।
কমলার বারমাসী গান করবাম প্রচার ।।"

(তদবে , ১৭৮)

এখানে গীতিকা পরিবেশনের উদ্দেশ্যমূলকতা অত্যন্ত স্পষ্টতা পেয়েছে। সর্বোপরি, এটিকে কবি বারোমাসি গান বলেছেন। ‘বারোমাসি গান’ লোকগানের একটি ধারা। একসময় পূর্ববঙ্গে এই ধরনের লোকগান একসময় যথেষ্ঠ জনপ্রিয় ছিল। সুদীর্ঘ গীতিকাটিতে অবশ্য বারোমাসির কিছু লক্ষণও রয়েছে।

‘কমলা কন্যার পালা’র ভূমিকায় ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক লিখেছেন :

> “এককালে পূর্ববঙ্গে হিন্দু-মুসলমান কৃষক সমাজে সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল, অভিজ্ঞ গায়েন এই সব পালা গান গাহিয়া বৃষ্টি নামাইতে পারেন। ১৯৩৫ খৃস্টাব্দের মে মাসে টাঙ্গাইলের উত্তর-পূর্ব পনরো মাইল দূরে বল্লারতনগঞ্জ বাজারে ১৯৪৪ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসে ধাকার দশ মাইল পশ্চিমে ভাকুরতা গ্রামে গায়েনের এই আশ্চর্য ক্ষমতা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি।দেখিয়াছি এই উদ্দেশ্যে পাল গাহিতে হিন্দু ও মুসলমান গায়েন তাহাদের নিজস্ব ওস্তাদ-গুরু পরম্পরা কতকগুলি বিশেষ নিয়ম প্রতিপালন করেন। সে নিয়মগুলির মধ্যে একবেলা হবিষ্যান্ন আহার ও আসরে গান গাহিবার সময় ছাড়া অন্য সময় মৌন থাকা হিন্দু-মুসলমান গায়েনদের একই প্রকার বিধান। দুই জায়গায়ই দেখিয়াছি গানের দ্বিতীয় রাত্রির শেষে বৃষ্টি নামিয়াছিল।” (তদেব, ১৭৬)।

ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক কর্তৃক সংগৃহীত “প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা”র দ্বিতীয় খণ্ডে রয়েছে, ‘কাঞ্চনকন্যা’ গীতিকাটি। এই গীতিকাটি দীনেশচন্দ্র সেনের সংগ্রহেও রয়েছে। দীনেশচন্দ্রের সংগ্রহে যখন ছত্রসংখ্যা ৪৬৯, তখন ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিকের সংগ্রহে রয়েছে ৭৫০ টি ছত্র। তাছাড়া, যা আমাদের অনুসন্ধানের বিষয়, তা যথাযথ ভাবে রয়েছে ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক-এর সংগ্রহে। দীনেশচন্দ্রের সংগ্রহে পালাটির নাম হল ‘ধোপার পাট’। পালাটির গভীরে প্রেমের ক্ষেত্রে বিশ্বাসভঙ্গের স্বরূপ ধরা রয়েছে।

গোধা নামক ধোপার চতুর্দশী কন্যা কাঞ্চনমালা অপূর্ব সুন্দরী। রাজকুমার তার প্রেমে মুগ্ধ হয়। কিন্তু প্রেম নিবেদনের পরেও কাঞ্চনমালা সাড়া দেয় না। কিন্তু এক সময় কাঠিন্য ভঙ্গ করে রাজকুমারের সঙ্গে সে প্রেমের বাঁধনে জড়িয়ে যায়। পরিস্থিতির কারণে দুজনকেই এক সময় ঘর ছাড়তে হয়। তারা হাঁটতে হাঁটতে চলে যায় অন্য এক রাজ্যে। এক ধোপার ঘরে তাদের আশ্রয় মেলে। সেই ধোপা সেখানকার রাজার কাপড় ধোয়। কাঞ্চনমালা এবং রাজকুমার ধোপাকে তার কাজে সাহায্য করতে থাকে। দুজনে মিলে সেই কাপড় দিতে যায় রাজবাড়িতে। সেখানকার রাজকন্যা রুক্মিণী রাজকুমারকে দেখে তার প্রেমে পড়ে যায়। সে নিজের প্রভাব খাটিয়ে বিবাহ করে রাজকুমারকে। অনেকে পরে রাজবাড়িতে রুক্মিণী ও রাজকুমারকে একত্রে দেখে বিস্মিত হয় কাঞ্চনমালা। মুহূর্তে সে সবই বুঝে যায়। প্রেমের প্রতি তার বিশ্বাস হারিয়ে যায়। ফিরে আসে সে পিতৃগৃহে। উন্মাদ লক্ষণও দেখা দেয় তার মধ্যে।

> “ বাপে কান্দে ঝিয়ে কান্দে গলা ধরাধরি।
> কার বা দোষ কেবা দেয় মনের আগুনে পুড়ি।।
> বাপেরে আগে কাইন্দা কাঞ্চন কয় দুঃখের কথা।
> দেশে বিদেশে ঘুইরা পাইল যত দুঃখ ব্যথা।।
> রাজার বাড়ির খবর কাঞ্চন পাইল বাপের আগে।
> সগগল হারাইছে কাঞ্চন কর্মের অনুরাগে।।”
>
> (মৌলিক-২, ১৯৭০, ৫৩)

শেষে পর্যন্ত কাঞ্চনমালা তার প্রিয়তম খুরাই নদীতে ঝাঁপ দেয়। নদীর প্রবল জলস্রোতেই মিশে যায় তার প্রাণপ্রবাহ।

স্পষ্টতই কাঞ্চনকন্যার বিয়োগান্তক পরিণতি ঘটে। ট্র্যাজিক এই পরিণতি, পালার শ্রোতাদের মনকে বেদনাসিক্ত করে। কিন্তু, বর্তমান আলোচনায় কেন পালাটির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হল, তা এখনো স্পষ্টতা

পায়নি। পল্লীগায়েন সংক্ষেপে ঘটনার বিবরণের সঙ্গে উদ্দেশ্যমূলকতার দিকটির প্রতিও আলোকপাত করেছেন। তিনি গানে গানে জানিয়েছেন --

“কোন দেশতেন আইছ রে ঢেউ
তুমি যাইবা কোথাকারে।
আমারে ভাসাইয়া লও
সে না দুস্তর সাওরে।।
এই না বইলা কাঞ্চনকন্যা
জলে দিল ঝাঁপ।
কোথায় রইল রাজার কুমার
কোথায় রইল বাপ।।
তারা হইল নিমি ঝিমি
সে নিরাইতের নিশাকালে
ঝম্প দিয়া পড়ে কন্যা
খুরাই নদীর জলে।।”

(মৌলিক-২, ১৯৭০ , ৩৫)

পালাটির শেষে কয়েকটি পংক্তি হলো :

হায় রে, ডুইবা গেল কাঞ্চনমালা
জল হইল থির।
দেওয়ায় ডাকে আকাশ ফাইট্টা
হইল রে চৌচির।।

(তদেব)

এখানে পালা রচয়িতা, পালা পরিবেশক , সর্বোপরি শ্রোতৃসাধারণের উদ্দেশ্যমূলকতা স্পষ্টতা পেয়ে যায়। চাষাবাদের প্রয়োজনে জমিতে জলের প্রয়োজন হয়। যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে , সে সময়ে মানুষকে সব সময়ে প্রকৃতির মেজাজ মর্জির উপর নির্ভর করতে হয়েছে। এসব গীতিকা পরিবেশনের উদ্দেশ্যমূলকতার দিকটি এখানে স্পষ্টতা পেয়ে যায়। অবশ্য, পূর্ববঙ্গ গীতিকার সবগুলোই যে বৃষ্টি আবাহনের জন্য পরিবেশিত হত , তা নয়। বরং ভিন্ন উদ্দেশ্যমূলকতাও ছিল। আমরা কি তাহলে অতীতের সংগে সম্পর্ক-বিচ্যুত হয়ে গীতিকা সম্পর্কে ভ্রান্ত কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাচ্ছি বার বার ? কী ছিল গীতিকা পরিবেশনের মূল লক্ষ্য ?

।। চার।।

মানুষের জীবন যাত্রা শুরুর দিনগুলি ছিল বড়ো বেশি বিভীষিকাময় । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে বসবাস , যুদ্ধ করে বেঁচে থাকা, গোষ্ঠীকে বাঁচিয়ে রাখা এবং খাদ্য সংগ্রহের অতিরিক্ত কিছু করার অবকাশই ছিল না । প্রকৃতির নিষ্ঠুর আচরণ , বন্য প্রাণীদের সহিংসতাকে ক্রমাগত বল তথা শক্তি প্রয়োগ করে , পরে বুদ্ধি প্রয়োগ করে এবং মেধা খাটিয়ে জয় করার চেষ্টা চালিয়ে গেছে। পশু-শিকার এবং ফল-মুল আহরণ করে হাজার-হাজার বছর জীবন-প্রবাহকে বাঁচিয়ে রেখেছে মানুষ। ফল-মুল আহরণের সূত্রেই মানুষ নতুন এক অগ্রগতির ধাপে পা রেখেছে। এই সুদীর্ঘ সময়ে মানুষ বিশ্বাস করেছে অলৌকিক শক্তির অস্তিত্বকে। আত্মার পূজা , সর্বপ্রাণবাদ, জাদুমূলকতা , টোটেম , ট্যাবু ইত্যাদিতেই আস্থা স্থাপন করেছে আমাদের আদিম প্রপিতামহরা । যেদিন পশুশিকার থেকে সামান্য সরে মানুষ কৃষির জগতে পা রেখেছে তখনই মানুষের বেঁচে থাকার কায়দা-কানুন বদলে গেছে। পশুশিকারের পর্বে শিকারই ছিল মুখ্য । কিন্তু কৃষিকর্মে মানুষ যত বেশি সম্পৃক্ত হয়েছে , প্রকৃতি-নির্ভরতা বেড়ে গেছে তত বেশি করে।

শকিার-পর্বে অস্ত্র নর্িমাণ করা , পর্বতগাত্রে শকিাররে ছবি এঁকে নানাভাবে শকিাররে ভঙ্গি সহ নৃত্যগীত করার রীতি ছলি। গান, কাজ আর নাচরে যে আদি-সম্পর্ক এই বষিয়ে পণ্ডতিরো নানা অভমিত দয়িছেনে । আদতিে নাচ ছাড়া গান গাইবার প্রয়োজন অনুভূত হয়নি । নাচ এবং গান , উৎপাদন কর্মরে সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত । সুতরাং নাচ এবং গান যে এককালে ছলি উদ্দশ্যেমূলক এবং প্রয়োজনীয় , বলাই বাহুল্য। প্রাথমকি পর্যায়ে দশজনে মলিে উৎপাদন কার্যে ব্যাপৃত থাকাটাই ছলি আবশ্যকি কর্ম । কাজরে প্রয়োজনে নর্িমতি স্থূল হাতয়িার দয়িে একা সম্পূর্ণ কাজকে শষে করা ছলি অসম্ভব। ক্রমে ক্রমে মানুষ তা থকেে বরেয়িে আসতে পরেছে। কন্িতু যৌথভাবে টকিে থকেে কর্ম করার প্রয়োজন যে এতে মটিে গছেে তা নয়।

কাজ শুরুর আগইে মানুষ শুরু করছে কামনা সফল হবার কল্পনা । আর কল্পনায় মানুষ ওই ছবটিইি দখেতে চয়েছে। ফলে নাচ আর গানরে আয়োজন। নাচ হচ্ছে আগাগোড়া কামনা সফল হবার অনুকরণ আর গানও হচ্ছে
তাই। সাহস সঞ্চয় করে কাজে ঝাঁপয়িে পড়লইে আসবে আগাগোড়া সাফল্য। জ্যান হ্যারসিনে বলছেনে --

> “When a savage wants sun or wind or rain, he does not go to church and prostrate himself before a false god; he summons his tribe and dance a sun dance or a wind dance or a rain dance. When he would hunt and catch a bear, he does not pray to his god for strength to outwit and outmatch the bear, he rehearses his hunt in a bear dance.” (J. Harrison , Ancient Art and Ritual, London,1935).

এর বঙ্গানুবাদ করলে দাঁড়ায় :

> “আদমি মানুষ যখন রোদ, হাওয়া বা বৃষ্টি চায় তখন সে দবোলয়ে গয়িে কোনো অলীক দবেতার পায়ে লুটয়িে পড়ে না। সে ডাক দয়ে নজিরে গোষ্ঠীকে এবং রোদরে নাচ বা বৃষ্টরি নাচ নাচতে শুরু করে। ভালুক শকিার করবার ভালুকটকিে হারয়িে দবোর জন্য সে তার দবেতার কাছে শক্তি ভক্ষিা করে না ; ভালুক নাচ নচেে শকিাররে মহড়া দয়িে নয়ে।” (চট্টোপাধ্যায় , ১৪১৩ , ১৪৮)।

নাচরে সঙ্গে গানকে বচ্ছিন্নি করে দখোর সুযোগ নইে । আসল কাজরে সঙ্গে জাদুবশ্বিাসরে যে তফা রয়ছে, মানুষ সটো বুঝে উঠতইে পারনে প্রথমে। জাদুবশ্বিাস থকেইে যে সঙ্গীতরে জন্ম, তা-ও বলছেনে গবষেকরো। অর্থা কামনা ও জাদুবশ্বিাসই সঙ্গীতরে জন্মদাতা।

> “এই কামনাকে কল্পনায় সফল করে প্রাচীন মানুষ মনে করছে যে বাস্তবকি তা বুঝি সফল হতে চললো।” (তদবে , ১৫৫)।

‘সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা’ বঙ্গভূমি কৃষপ্রিধান। প্রকৃতরি উপর নর্িভরতা তাই স্বাভাবকি কারণইে জন্মছে। প্রকৃতি প্রসন্ন থাকলে মানুষ স্বাভাবকি বাঁচবে । নতুবা মৃত্যু অবধারতি । ফলে খাদ্যরে জন্য এসব কর্মগুলোতে মানুষ স্বাভাবকি পথ ধরইে মানুষ নয়িোজতি করছে নজিদেরে।

নারীদরে দ্বারাই কৃষকির্মরে ভত্তিি স্থাপতি হয়ছে, অবশ্য পুরুষরাও সে কর্মে নয়িোজতি হয়ছে। শ্রমকে লাঘব করার জন্য যমেন নতুন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবতি হয়ছে , তমেনি স্বাভাবকি পথ ধরইে কর্ম বভিাজনও ঘটছে। নারীদরে ভূমকিা কন্িতু এতে খর্বতি হয়নি।বরং নারীর যে কৃষদ্রিব্য উৎপাদনওে ভূমকিা সে রকম বশ্বিাস মানুষ গভীরভাবে করে এসছে। নারীরা যে সন্তান জন্মদানরে ক্ষমতা রাখে, সে বষিয়টি সুদূর অতীতইে মানুষরে অন্তরে বস্ময় জাগয়িছে। সমান্তরালভাবে মাটওি ফসলরে জন্ম দয়ে। ফলে নারী ও মাটি কখনো কখনো হয়ে উঠছে সমান গুরুত্বপূর্ণ । ফসল প্রাপ্তরি জন্যে প্রকৃতরি উপরইে আদ্যকিাল থকেে ভরসা করে এসছে মানুষ। আর ঠকি এই কারণইে ফসল প্রাপ্তরি সংগে সম্পর্কতি যাবতীয় কৃত্যালরি সংগে নারীদরে সম্পর্ক এতখানি গভীর । নারীর শ্রম এবং নারীর মৃত শরীরও ফসল–প্রাপ্তি সম্পর্কতি বশ্বিাস-সংস্কাররে সঙ্গে জড়য়িে গছেে গভীরভাবে। এমনই একটি উদাহরণ নওেয়া যতেে পারে । পাওনি আদবিাসীদরে

মধ্যে প্রচলিত কুমারীবলি'র একটি চিত্র এটি। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের একটি ঘটনা। কোনো এক বসন্ত উৎসবের সময় একটি তেরো-চৌদ্দ বছরের মেয়েকে বলি দেওয়া হল। এর আগে মেয়েটিকে লালন-পালন করা হয়েছিল। তার দু'দিন আগে গোষ্ঠীর মোড়ল আর যোদ্ধারা মেয়েটিকে নিয়ে বাড়ি বাড়ি পরিক্রমা করল।

উৎসবের দিন মেয়েটিকে একটি নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে আসা হল, যেখানে মেয়েটিকে বলি দেওয়া হবে। তার দেহে অর্ধেক কালো আর অর্ধেক সাদা রঙ করে দেওয়া হল। একটি গাছের সংগে তাকে বাধা হয়। তারপর নরম আগুনের আঁচে ঝলসানো হয় মেয়েটিকে। শেষে তীর দিয়ে বিদ্ধ করতে করতে মেয়েটিকে মেরে ফেলা হয়। প্রধান পুরোহিত এসে মেয়েটির হৃদপিণ্ড ছিঁড়ে খেয়ে ফেলে। শরীর থেকে মাংসগুলো ছাড়িয়ে ঝুঁড়ি ভরতি করে নিয়ে যাওয়া হয় শস্যক্ষেত্রে। গরম মাংসের টুকরো থেকে রক্ত নিংড়ে বের করে শস্যবীজের সঙ্গে মেশানো হয় এবং সেগুলো ছড়িয়ে দেওয়া হয় জমিতে। মাংসপিণ্ডগুলোকে পুঁতে ফেলা হল। (সরকার , ১৩৯০ , ৩০)। এহল জমিতে ফসল প্রাপ্তির কামনায় মানুষের বিশ্বাস-সংস্কারের একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। এমন অগুনতি উদাহরণ মিলবে।

কৃষিকর্মে নারীদের সক্রিয় ভূমিকা পরিমাপ যোগ্য নয়। জন্মদানের ক্ষমতা যে নারীদেরই একচেটিয়া এমন বিশ্বাসই বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল আমাদের প্রপিতামহদের মনের গভীরে। ফলে এই দায়িত্ব বর্তেছে নারীদের উপর। বৈদিক ঐতিহ্যে অবশ্য নারীরা ততখানি গুরুত্ব পায়নি। বঙ্গভূমি বরাবরই বেদ বহির্ভূত অঞ্চল। এখানে রয়েছে উর্বর কৃষিভূমি। সেখানে নারীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন --

> "অভাব মেটানোর তাগিদ বলতে প্রধানতই দু'রকম। এক: আত্মরক্ষা আর নিরাপত্তা। দুই : শস্য। পশু আর সন্তানের সংখ্যাবৃদ্ধি। পুরুষেরা স্বভাবতই প্রথম উদ্দেশ্যটির পক্ষে উপযুক্ত , নারীরা দ্বিতীয়টির।" (চট্টোপাধ্যায় , ১৪১৩ , ১৪৮) ।

মাটিতে শস্য উৎপাদনের কৌশল যেহেতু নারীদের মজ্জাগত, তাই নারীদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে স্বাতন্ত্র্য জন্মেছিল অনেক আগেই।

বঙ্গের মানুষ গানকে প্রাণের সম্পদ হিসেবে গ্রহণ করেছিল। কোন সুদূর অতীত থেকে মানুষ এই পথ অবলম্বন করেছিল, তা বলা অত্যন্ত কঠিন। বঙ্গে যে কত ধরনের গান মানুষ গেয়েছে , তার তালিকা সুদীর্ঘ। বাঙলাদেশের ব্রতেও আমরা দেখি, মানুষ ব্রত করছে , ব্রত শেষে রয়েছে নৃত্য-গীতের আয়োজন। কিছু পাবার জন্য গাওয়া এবং কিছু পেয়ে গেলে গাওয়া – এই দুটো বিষয়ই রয়েছে। ব্রত মানত করছে নারীরা , তখনো গাইছে ; আবার মনোকামনা পূর্ণ হলেও গান গাইছে। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন --

> " নাচ-গানের সঙ্গে কাজের এই যে যোগাযোগ এর মূলে রয়েছে আদিম মানুষদের একটি অদ্ভুত বিশ্বাস। এর নাম জাদুবিশ্বাস -- ইংরেজিতে বলে বলে ম্যাজিক। কী রকমের বিশ্বাস ? কল্পনায় প্রকৃতিকে জয় করতে পারলে বাস্তব ভাবে প্রকৃতিকেও জয় করাও সত্যি সম্ভবপর হবে। কল্পনায় জয় করা মানে কী? জয়ের একতা নকল তোলা -- কামনা সফল হয়েছে তারই যেনো অভিনয় করা । আকাশে বৃষ্টি চাইলে ওরা দলের সবাইকে ডাক দিয়ে শুরু করবে বৃষ্টির নাচ : আকাশে জলের ছিটে ছুঁড়ে বৃষ্টির নকল তুলবে, বাজনা বাজিয়ে নকল করবে মেঘের ডাক , আর ওরা ভাববে মেঘের ডাক, আর ওরা ভাববে এইভাবে কামনা সফল হওয়ার নকল করে সত্যিই বুঝি কামনাকে সফল করা সম্ভব হবে" (তদেব , ১৪৯) ।

পূর্ববঙ্গ গীতিকাগুলোর সূচনায় অথবা সমাপ্তিতে কখনো কোনো না কোনো কামনা–বাসনার কথা ব্যক্ত হয়েছে। এটা প্রাচীন ধারণা এটাই যে , কামনাকে কল্পনায় সফল করে তুললে , বাস্তবেও তা সফল হবে। এভাবে কামনার সঙ্গে জাদুবিশ্বাসের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। জাদুবিশ্বাসের থেকে যে সঙ্গীতের জন্ম একথা পণ্ডিতেরা আগেই জানিয়েছেন। আমাদের ছান্দোগ্য উপনিষদেও, বৃষ্টি হবার জন্য সামগান গাইবার কথা ঋষিরা বলেছেন। (তদেব , ১৫৬) । সেখানে বলা হয়েছে --

“বৃষ্টৌ পঞ্চবিধং সামোপাসীত পুরোবাতো হিঙ্কারো মেঘো জায়তে স প্রস্তাবো বর্ষতি স উদ্গীথো বিদ্যোততে স্তনয়তি স প্রতিহারঃ ।।২.৩.১।।
উদগৃহ্ণাতি তন্নিধনং । বর্ষতি হাস্মৈবর্ষয়তি হ য এতবেদং বিদ্বান বৃষ্টৌ পঞ্চবিধং সামোপাস্তে ।। ২।৩।২।।”

অনুবাদ করলে দাঁড়ায় :

“ বৃষ্টিতে পঞ্চবিধ সাম উপাসনা করিবে : বৃষ্টির পূর্বে যে বায়ু উত্থিত হয় তাহাই হিঙ্কার, মেঘে উত্তাপিত তাহাই প্রস্তাব , বৃষ্টি পতিত হয় তাহাই উদ্গীথ , বিদ্যু□ চমকায় ও গর্জন করে তাহাই প্রতিহার , বৃষ্টিপাত শেষে হয় তাহাই নিধন । যিনি ইহাকে এইরূপ জানিয়া বৃষ্টিতে পঞ্চপ্রকার কাম গানের উপাসনা করেন তাহার জন্য মেঘবর্ষণ করে এবং তিনি বর্ষণ করাইতে পারেন ।” (চট্টোপাধ্যায় , ১৪১৩ , ১৫৬)

এখানে বৃষ্টি-জাদুর কথা নানা ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। পুরববঙ্গ গীতিকাতেও প্রকৃতিকে বশ করার উদ্দেশ্যটি কোথাও কোথাও উচ্চারিত হয়েছে । সময় এগিয়ে চলেছে। তারই সঙ্গে মানুষের এগিয়ে চলার কাজটিও থেমে নেই ।

নারীদের আশ্চর্য ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করে মানুষের বিস্ময়ের সূচনা ঘটেছিল চেতনার সূচনালগ্ন থেকেই । নানা প্রক্রিয়ায় মানুষ শুরু করেছিল নারীবন্দনা । সেই বন্দনা যেমন মন্ত্রে সম্পন্ন হয়েছে , তেমনি গানে গানে সম্পন্ন করার কাজ ধারাবাহিক ভাবে করে গেছে মানুষ । এসব গানে রয়েছে জাদুভাবনা--যে জাদুর প্রভাবে জমিতে ভালো ফসল উ□পাদিত হবে। প্রয়াতজনের আত্মা অশুভ স্বরূপে মানুষের কোন ক্ষতি করবে না, বরং সার্বিক কল্যাণ করবে গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের । কৃষিপ্রধান বঙ্গভূমিতে এভাবেও নারীবন্দনার কাজ সম্পন্ন হয়েছে । এমন নারীরাই বন্দিত হয়েছেন যারা ব্যতিক্রমী । মানুষের সাধারণ কাজকর্মের সীমা অতিক্রম করে যারা নিজেদের মেধা ও চেতনার জোরে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে , গান বা স্তব রচিত হয়েছে তাদেরই অবলম্বন করে । সময় তো এগোয় । একই সঙ্গে চেতনার জগতেও পরিবর্তন ঘটে । এককালে যা ছিল মন্ত্র পরে তাতে সংযোজিত হয়েছে তা□পর্যপূর্ণ ভাষা ও সুর। ক্রমে ক্রমে বদলে গেছে উপস্থাপনার রীতি-পদ্ধতিও ।

গীতিকা’র উপস্থাপক তথা গায়েনের দিক থেকে বিষয়টির পর্যালোচনা করা যেতে পারে। বয়াতি বা গায়েনেরা গীতিকা পরিবেশনের আগে কিছু নিয়ম-কানুন পালন করে । দৃষ্টান্তস্বরূপ ব্রত পালনকারী নারীরা ব্রত পালনের আগে সংযম রক্ষা করে । যেমন, ব্রতের পূর্বদিনে নিরামিষ আহার ,স্বল্পাহার, রাতে না খেয়ে থাকা, ব্রতের দিন ব্রত না হওয়া পর্যন্ত উপোসী থাকার নিয়ম পালন করা হয়। ব্রত পালনকারীদের জন্য এসব হলো অবশ্যপালনীয় । এর অন্যথা হয় না। নিয়ম ভঙ্গ করলে উদ্দেশ্য সফল হয় না । গায়েনদেরও গান অর্থা□ গীতিকা পরিবেশনের নেপথ্যে উদ্দেশ্যমূলকতার স্বরূপটি তাই বুঝে নেওয়া যায় । গৃহযাত্রা , দেবালয় প্রতিষ্ঠা , মাতা-পিতার শ্রাদ্ধদিবস থেকে শুরু করে জমিতে ভালো ফসল ফলানোর জন্য বৃষ্টি–কামনায়ও অবস্থাসম্পন্ন গৃহস্থ এরকম অনুষ্ঠানের আয়োজন করত ।

এমনকী গীতিকানুষ্ঠান শুরুর প্রারম্ভে গৃহস্থ নিষ্ঠা সহকারে একটি ঘটও স্থাপন করে। যে কোনো ব্রত বা মাঙ্গলিক কর্মে ঘট স্থাপনের সঙ্গে এর কোনোই পার্থক্য নেই । দেবমূর্তি নির্মাণ করে পূজা সম্পন্ন করার অনেক আগে থেকেই ঘট প্রতিষ্ঠা করে মাঙ্গলিক কর্মাদি সম্পন্ন করার সামাজিক রীতি প্রচলিত ছিল । একই সঙ্গে লক্ষণীয় যে, গীতিকার সূচনায় রয়েছে দেববন্দনা । একে গীতিকা থেকে আপাত বিচ্ছিন্ন মনে হয় । কিন্তু তা গীতিকারই অবিচ্ছেদ্য ও অপরিহার্য অঙ্গ। বর্তমান সময়ে অবস্থান করে অতীতের মূল্যায়ন করা সহজ নয় । গীতিকা পরিবেশনই যখন উদ্দেশ্যমূলক, সেখানে দেববন্দনা আদৌ বর্জিত অংশ হতে পারে না । দেবদেবীরা যখন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন , সেক্ষেত্রে তাদের খুশি রাখার সব রকমের প্রচেষ্টা বয়াতি, গায়েন এবং ভোক্তা করে গেছে ।

বাঙালির ধর্মাচারে নানা বৈচিত্র্য দেখেছি আমরা। লোকজীবনে ধর্মের স্বরূপ যাই হোক না কেন , সহজ-সরল জীবন-যাপনে তারা অভ্যস্ত ছিল। ধর্মাচারের অঙ্গ হিসেবেই পূর্ববঙ্গ গীতিকা জনজীবনে স্থান করে নিয়ে নিয়েছিল । বৌদ্ধ–সহজিয়া চেতনা বাঙালি চরিত্রে উদারতার যে বীজবপন করে দিয়েছিল , পরবর্তীকালেও হিন্দু-মুসলমান সমন্বয় চেতনার বাধার কারণ হয়ে দাঁড়ায়নি। ধর্ম মানুষকে বরাবরই কঠোর-কঠিন বাঁধনে বন্দী করে রাখতে চায়। যত দিন গেছে হিন্দু-মুসলমানে বিভেদ বেড়েছে। নারীদের স্বাধীন চেতনা ধর্মগুরুদের কাছে নিন্দিত হয়েছে। চাষাবাদের কাজে দক্ষ মুসলমান–চাষিরা গীতিকার জাদুমূলকতার জগত থেকে সরে আসতে পারেনি। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেন 'প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান' বইয়ের এক জায়গায় লিখেছেন "... বহু পূর্বেই এই দেশে হইতে এই পল্লী সাহিত্যের ধারা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইত , যদি না মুসলমানগণ ইহাকে রক্ষা করিত" (সেন , ২০১৪, ৫৬) । অধ্যাপক সেন যথার্থই বলেছেন। গীতিকাগুলিতে কবিত্বের বিচার-বিশ্লেষণ নিয়েই আমাদের যাবতীয় উদ্দীপনা , অপর পিঠে চোখ তুলে দেখবার অবকাশই আমাদের হয়নি এতকাল। অধ্যাপক পল্লব সেনগুপ্ত লিখেছেন :

> " আমরা যতই এগিয়ে থাকি না কেন হাজার-হাজার বছরের বিবর্তনে , আমাদের মনে অন্তর্লীন হয়ে আছে সেই প্রাগৈতিহাসিক কালের অজস্র-অব্যক্ত সংস্কার — মহাকালের স্রোতে ফেলে যাওয়া বহু বহু শতাব্দীর পলিতে তারা চাপা পড়ে আছে, এই মাত্র। সে অতীত কেবলমাত্র আমাদেরই নয় ; তা বিশ্বজগতের সমস্ত কৃষ্টি বলয়েরই। সে অতীতকে চেনাবারই একটি শ্রেয় ও সুনিশ্চিত পথ হল বিবাহের এবং অন্য অজস্র ধরনের সামাজিক আয়োজনের এবং সাজসজ্জা বসন-ভূষণের বিন্যাসের জীবন চর্যার বহু বিচিত্র প্রকরণের অন্তর্বিলীন লোকাচারগুলির চর্যা , যারা সর্বদাই নিয়ন্ত্রিত হয় অলক্ষ্য সঞ্চারী আদিম বিশ্বাসজাত সংস্কার মগ্নতার অনুসঙ্গে"। (সেনগুপ্ত, পল্লব : ২০১৮, ৯৭)

গ্রন্থপঞ্জি:

চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ : ১৪১৩, লোকায়ত দর্শন , নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার : ২০০৯-১০, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (তৃতীয় খণ্ড , দ্বিতীয়ার্ধ) , মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

মুখোপাধ্যায়, সুখময় , গঙ্গোপাধ্যায় , সুখেন্দুবিকাশ (সম্পাদিত) , ২০১০ , ময়মনসিংহ গীতিকা , কলকাতা ৯

মৌলিক, ক্ষিতীশচন্দ্র (সম্পাদিত) , ১৯৭০, প্রাচীন পুর্ববঙ্গ গীতিকা, প্রথম খণ্ড, ফার্মা কে এল এম ,কলকাতা,

--------------------------------, ১৯৭০, প্রাচীন পুর্ববঙ্গ গীতিকা, দ্বিতীয় খণ্ড, ফার্মা কে এল এম ,কলকাতা

--------------------------------, ১৯৭১, প্রাচীন পুর্ববঙ্গ গীতিকা, তৃতীয় খণ্ড, ফার্মা কে এল এম ,কলকাতা

--------------------------------, ১৯৭৫, প্রাচীন পুর্ববঙ্গ গীতিকা, সপ্তম খণ্ড, ফার্মা কে এল এম ,কলকাতা

সরকার, দীনেন্দ্রকুমার, ১৩৯০ , মানব সভ্যতায় কুমারী বলি, (দ্বিতীয় পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ), পুস্তক বিপণি, কলকাতা

সেনগুপ্ত, পল্লব : ২০১৮, (চতুর্থসংস্করণ), লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা

সেন, ড দীনেশচন্দ্র : ২০১১, (প্রথম প্রকাশ : ১৯৩৮) প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান, কথা, ই/4 রামগড়, কলকাতা

সেন , সুকুমার : ১৪১৪ (অষ্টম মুদ্রণ), বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড) , আনন্দ পাবলিশার্স , কলকাতা

Dr. Nirmal Das is an Assistant Professor in the Dept.of Bengali, Tripura University. He can be reached at: nirmaldas@tripurauniv.in